রানি রাসমণি যেন রিজিয়া সুলতানা, অহল্যাবাঈয়ের যোগ্য উত্তরসুরী

উমা সেনাপতি

বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণার হালিশহরের কাছে কোনা গ্রামে মামার বাড়িতে ১৭৯৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাসমণির জন্ম হয়। বাবা দরিদ্র কৃষক হরেকৃষ্ণ দাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। মা রামপ্রিয়াদেবী রাসমণির সাত বছর বয়সে মারা গেলে বালবিধবা পিসিমা তাঁকে পালন করেন। ছোটবেলা বাবার কাছে তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। তখনকার বিধিমত এগারো বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হয় কলকাতার জানবাজারের রাজবাড়িতে রাজা রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে। ছোটবেলা থেকেই তিনি অতুলনীয় রূপ, গুণ, উন্নত চরিত্র ও শক্তির অধিকারিনী ছিলেন। যার ফলে পরে সকলের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা পান। ক্রমে তিনি হলেন কণাময়ী লোকমাতা রানি রাসমণি। রাজ্যের অন্ধদরিদ্র অসহায় প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন রানিমা।

রানি রাসমণির মধ্যে ঘটেছিল বিবিধ সৎগুণের সমন্বয়। তখনকার দিনে মেয়েরা সংসারে আড়ালেই থাকতেন। রাজবধূ রাসমণি ও সংসারের কর্ত্রীরূপে রাজবাড়ির মধ্যে থাকতেন। কিন্তু অন্দরমহলের আড়ালে থেকেও নানা কল্যাণমূলক কর্মের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং স্বামীকে বিভিন্ন সংকর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। তাঁর ছিল অসাধারণ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব। তিনি একধারে লোককল্যানময়ী রানি, অন্যদিকে সমাজ ও দেশের সেবা করেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মাতা। তাইতো তিনি লোকমাতা ও ব্রহ্মমাতা। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সংসারের দ্বারা তিনি নূতন যুগের সূচনা করেন,তাই তাঁকে বলা হয় 'যুগজননী'। তাঁর যুগান্তকারী ভাবনা ও কর্মের পথ ধরেই আমরা পেয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও মিশনের সেবাযজ্ঞ, ঋষি অরবিন্দ, বাঘাযতীন প্রমুখ সমাজসেবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। তিনি ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের পথিকৃৎ। জাতীয়তাবাদের জননী। তপস্বিনী জগন্মাতা। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি ছিলেন 'রানিমা'- জগদম্বার অষ্টসখীর অন্যতমা - মায়ের পূজা প্রচারের জন্যই তিনি এসেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে রাসমণির মধ্যে মিশে গিয়েছিল ব্রাহ্মণের সমদর্শিতা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রতেজ। বৈশ্যের বিষয়বুদ্ধি এবং শূদ্রের নিরহংকার নিষ্কাম সেবাধর্ম। তাঁর চরিত্র ও কর্মের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি ইতিহাসে উপেক্ষিতা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এই বাংলার তাঁর জন্ম এই কলকাতাকে কেন্দ্র করে গ্রামে ও গঞ্জে তাঁর সেবা ও কর্মকান্ড বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির কাছে তাঁর জীবন ও কীর্তি আলোচিত ও আলোকিত হয়নি যথাযথভাবে। জাত্যাভিমানী পন্ডিতকুল ও তাঁদের অনুগামীরা শুদ্রানী বলে তাঁকে নীচু করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর নানা সৎকাজে বাধা দিয়েছেন বারবার। এটাতো ইতিহাসের কলংক। তবে তাঁরা কদর্থ করেছেন। মহান তবর্থে বা সদর্তে তিনি 'শূদ্রানী'। প্রকৃতপক্ষে সেবার মাধ্যমে সমাজকে শুদ্ধ করাই শূদ্রের কর্তব্য-মা যেমন সহজ স্নেহে সন্তানের মলমূত্র পরিষ্কার করে বুকে তুলে নেন। যতদিন যাবে ততই এই লোকমাতার জয়গান প্রচারিত হবে মহাকালের বিচারে।

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে মহিয়সী নারী রানি রাসমণি জন্ম। ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল তারকারা জন্মাবেন - তার আগে সেই যুগবার্তা নিয়ে এলেন কিছু যুগপুষ। এই মাঝের গুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর জন্ম। পলাশীর পতন ও ডিরোজিওর উত্থান। এরকম অস্থির অন্ধকার সময়ে তাঁর আর্বিভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বইকি। রাসমণির আগে জন্ম নিয়েছেন রামমোহন রায় (১৯৭২/৭৪), রাধাকন্ত দেব (১৭৮৪)। রাসমণির পর জন্মালেন - দ্বারকানাথ ঠাকুর, (১৭৮৪), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০), শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬) এবং আরও অনেকে। এই সব রথী মহারথীদের মঙ্গে মতের ঐক্য বিরোধ, সহযোগিতা ও বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে সসম্মানে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বহু কল্যাণ-সেবা ও সংস্কার-কর্ম করে গেলেন তিনি স্বামী রাজচন্দ্র ও পরে জামাই মথুরামোহনের মাধ্যমে অন্দরমহলের থেকেই এবং এক নতুন যুগ নিয়ে এলেন। এসবই বিস্ময়কর ঘটনা। সেযুগে মেয়েরা গৃহবন্দী হয়ে গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকত। কিন্তু তিনি সংসারের অন্তরালে থেকেই অতি-আধুনিক ও দূরদর্শী চিন্তাভাবনা সৎ কর্মের বিস্তার করেছেন লোক মারফৎ ও লেখার মাধ্যমে - যা খুবই আশ্চর্য।

তাঁর সমাজ ও দেশের জন্য বিবিধ কল্যাণকর্ম তুলে ধরার আগে তাঁর সমসাময়িক সমাজ, ধর্ম ও দেশের অবস্থা মনে করা দরকার। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হওয়ার পর ১৬৯০ সালের ২৪ অগস্ট জব জার্ণক কুঠি স্থাপনের জন্য কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা বিশাল বাহিনী নিয়ে ১৭৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণ করেন ও ইংরেজকে পরাজিত করেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালে সিরাজের সেনাপতি মিরজাফরের সাহায্যে ইংরেজ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজকে পরাজিত ও নিহত করে। সুতরাং ইংরেজ রাজত্ব শু হল। বাংলা তথা ভারতের সমাজ, ধর্ম, ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শোষণ, অপশাসনে নারী ও দারিদ্র নিম্ন শ্রেণীর মানুষের উপর অত্যাচার চলল। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কন্যাসন্তান বিসর্জন, শিশু ও নরবলী, অস্পৃশ্যতা, কৌলিন্যপ্রথা ইত্যাদি কুপ্রথা সামাজিক ব্যধিতে জীবনের অবক্ষয় বাড়ল। এই দুঃসময়ে লোভী ব্রাহ্মণের হাতে হিন্দুধর্ম ও বৈদিকধর্ম মানবকল্যাণের বদলে হয়ে উঠল আচার সর্বস্ব। শিক্ষিত সমাজের কিছু নব্য শিক্ষিত যুবক কুসংস্কারের বিদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করতে লাগল। মধুসূদন দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রতিভাবান যুবকেরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। ধর্মান্তরের এই হাওয়া ঠেকানোর জন্য রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রর্বতন করলেন।

সেযুগে ধনদৌলত ও সম্মানে জানবাজারের রাজবংশের গুত্ব ছিল বিশাল। কিন্তু রানি রাসমণি ছিলেন ঈশ্বরভক্ত, নিরহংকারী, সহজসরল, ধর্মপ্রাণ এবং অন্দরমহলের অন্তরালে থেকে নীরবে করে গেছেন দেশের ও মানুষের সেবা। তখনকার কলকাত,ার বহুগন্যমান্য ব্যক্তি রাজারামমোহন রায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, সুতানুটির রাজা রাজবল্লভ, প্রসন্ন ঠাকুর, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ অনেকে রাজচন্দ্রের প্রাসাদে আসতেন। এই প্রাসাদে এসেছেন ভারতবর্ষের বড়লাট স্যার অকল্যান্ড, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মালিক ধনকুবের জন বেব। কিন্তু এজন্য দম্ভ নয়, প্রতিপত্তি বা ধনগর্ব নয় বরং রাসমণির যুগান্তকারী ভাবনাচিন্তা, জীবন ও কর্মধারা, সমাজ সেবা মানবপ্রেম ও

দেশপ্রেম, এই জানবাজার রাজবংশকে দিয়েছিল এক উচ্চমর্যাদার আসন যা শ্রদ্ধাসহকারে ইতিহাসে স্মরণীয় থাকবে চিরকাল।
তাঁর অবদান ও কাজকর্মের কথা বলতে গেলে বিশাল হবে। তবু এই ক্ষুদ্র নিবন্ধেতা সংক্ষেপে বলতে হবে।
রাসমণি ছিলেন মানবতাবাদী। তাঁর প্রেরণায় রাজচন্দ্র দাস অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন - যেমন পিতা প্রীতিরামের মৃত্যু উপলক্ষে বাবুঘাট নির্মাণ, পরলোকগত মাতা যোগমায়ার নামে আহিরীটোলার ঘাট নির্মাণ, নিমতলার ঘাটের পাশে মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীদের জন্য বিরাট প্রাসাদগৃহ নির্মাণ ও তাদের ডাক্তার, ওষুধ ও সেবার ব্যবস্থা করা, বেলেঘাটা খাল খননের জন্য সরকারকে বিনাপয়সায় জমি দান এবং জনসাধারণের জন্য খালের উপর নির্মিত সেতু দিয়ে বিনাপয়সায় খাল পারাপারের ব্যবস্থা করা, চাষীদের সুবিধার জন্য বহু গ্রামে পথঘাট নির্মাণ, বিভিন্ন স্থানেও পুকুর ও দীঘি প্রতিষ্ঠা, ইংরেজ সরকার না করলে -১২৩০ বঙ্গাব্দে বন্যার্ত শহরবাসীদের দীর্ঘদিন বিনাপয়সায় অন্ন ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ও ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে নিয়মিত অর্থদান করেছেন।
রানি রাসমণি দক্ষিনেশ্বরের কালীবাড়িতে গৃহস্থ, সাধু সন্ন্যাসী, অন্ধ, আতুর, কাঙাল ফকিরদের জন্য অন্নদানের ব্যবস্থা করেন, বৃন্দাবনে, জন্মস্থানে কোনা গ্রামে, পিত্রালয় গোলাবাড়ি গ্রামে, হুগলীর ধোলাঘাটের পাশে বাবুগঞ্জে, কালীঘাটের আদিগঙ্গার তীরে স্নানের জন্য ঘাট নির্মাণ করেন। সোনা, বেলেঘাটা, ভাবনীপুরে বাজার স্থাপন করেন। কৃষকরা বারবার ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করলেও তাদের সাহায্য করেনি সরকার, কিন্তু কৃষকরা রানিকে বলতেই - রাসমণি এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মধুমতী নবগঙ্গা সংযোগকারী টোনার খাল খনন করিয়ে দেন। জানবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয় ২৫০০ টাকা দান করেন। সুবর্ণরেখা থেকে পুরী পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করিয়ে দেন। এছাড়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের দায়িত্ব নেওয়া এসবও করতেন।
ক্ষত্রিয় মাহিষ্য কন্যা হয়েও কলকাতার দরিদ্র জেলেদের জন্য ইংরেজ শাসকদের বিদ্ধে জামাই মাথুরের সাহায্যে আইনের সংগ্রাম করে গঙ্গায় নিষ্কর মাছ ধরবার ব্যবস্থা করেছেন - যা আজও চলছে। ইংরেজ সরকার এই মহিলার কাছে নত হতে বাধ্য হয়েছে - কলকাতার কোন বড় বড় পুষেরাও ও সাহস দেখাতে পারেনি। এ ঘটনায় রানিকে সবাই ধন্য ধন্য করে এবং লোকছড়া বা প্রবাদ তৈরী করল-'ধন্য রানি রাসমণি সবার সেরা শিরমণি
কলকাতার পুষ বলতে একজন, তিনি হলেন রাসমণি'।
এসময় থেকেই জেলের জন্য দরদ - কাজেই রাসমণি জেলের মেয়ে - একথা বটে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সন্ন্যাসীদের দ্বারা রোমারোলাঁকে দিয়ে যে রামকৃষ্ণজীবনী লেখানো হয় তাতেও রামমণিকে ছোট জাত বলা হয়। কিন্তু তাতে কি আসে যায় - রাসমণি অকলংক কীর্তিময়ী ও পরম শ্রদ্ধেয়রূপে স্মরণীয় থাকবেন চিরকাল।
ঐসব মানবকল্যাণমূলক কাজ, তীর্থযাত্রা, তীর্থস্থানে তীর্থযাত্রীদের জন্য নানা সুব্যবস্থা, পূজাপার্বণ উপলক্ষে মানুষদের সাহায্য ও খাওয়ার ব্যবস্থা এসবের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হত। সুতরাং বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিপুল বিষয়সম্পত্তি সামলাবার দক্ষতা, বুদ্ধি ও ক্ষমতাও ছিল তাঁর। শ্বশুর প্রীতিরাম দাস, ও স্বামী রাজচন্দ্র দাসের রেখে যাওয়া বিশাল অর্থ ও সম্পত্তি রক্ষা করেছেন ও তাকে আরও বাড়িয়েছেন। দক্ষিনেশ্বরের দেবসেরা, অতিথিসেবা, কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতির বিশাল ব্যয়ভার বহন ও তীর্থের সুরক্ষার জন্য ১৮৫৫ সালে ঐ ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে দিনাজপুর জেলার শালবাড়ি পরগণার অধীন তিনটি লাট কিনে এগুলিকে দেবত্তোর সম্পত্তিরূপে দানপত্র দলিল করে যান। উত্তবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত বিষয়সম্পত্তি তিনি দক্ষতায় পরিচালনা করেছেন। এর সঙ্গে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সাহস, মনের জোর, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, দূরদর্শিতা, ধৈর্য ও সহনশক্তি। তিনি গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে জমিদারী পরিচালনা করতেন ও সিদ্ধান্ত নিতেন তিন জামাই, নায়েব, গোমস্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে বসে তা আলোচনা ও পরামর্শমত। তিনি শুধু নামেই রানি ছিলেন না বিভিন্ন কাজ কর্মের সফলতায়ও ছিলেন মহারানি।
সমাজসংস্কার আন্দোলনে রাসমণির অবদানও অনেক। প্রাসাদের ভিতর থেকে স্বামীর মাধ্যমে রামমোহন কর্তৃক সতীদাহ প্রথার বিলোপ সমর্থন করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরাই এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। রানি রাসমণি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকেও সমর্থন করেন। রানির বাড়িতেই বিধবা বিষয়ক আলোচনা সভা বসত। এরকম সভাতেই বিদ্যাসাগর নিজের ছেলে নারায়ণচন্দ্রের সাথে এক বিধবার বিবাহ দেবার প্রতিজ্ঞা করেন এবং পরে এ বাড়িতেই রানিমার খরচেই ঐ বিবাহ সম্পন্ন হয়।
শিক্ষাবিস্তার ও চিকিৎসা বিষয়েও তাঁর অবদান অনেক। শিক্ষাবিস্তারের জন্যই মেট্রোপলিটন স্কুলকে (বিদ্যাসাগর কলেজ) অর্থদান ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (ন্যাশনাল লাইব্রেরী) উন্নতির জন্য এককালীন ১০ হাজার টাকা দান করেন। হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সি কলেজ) স্থাপনের সময় অর্থদান এবং ও কলেজে পড়ার জন্য ১০ জন গরীব ছেলের থাকা খাওয়া সমেত সমস্ত খরচ বহন করেন। কলকাতায় হসপিটাল (বর্তমান মেডিকেল কলেজ) স্থাপনের জন্য ১৫ হাজার টাকা দান করেন।
প্রজাদের উপর নীলকর সাহেবদের জুলুম ও অত্যাচার হলে পাইক পাঠিয়ে সাহেবদের লোকদের পেটানোর ব্যবস্থা করলে সাহেবী জুলুম বন্ধ হয়। সাহেবরা রানির বিদ্ধে যাওয়ার সাহস করেনি। দীনবন্ধুর 'নীল দর্পন' পড়ে এসব জানা যায়।
তিনি ছিলেন নির্ভীক, আত্মমর্যাদাপূর্ণ ও স্বাধীনতাপ্রিয় তাই আরও বহু দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। রাত্রে দুর্গাপুজোর বাজনার ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় মিছিল ও বাজনা না থামলে গোরা সৈন্যরা গুলি করবে হুমকি দিলে - রাসমণির নির্দেশে তাঁর বন্দুকধারী লোকেরা গোরাদের বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে মিছিল পরিচালনা করেন। এজন্য ইংরেজ সরকার রানির ৫০ টাকা অর্থদন্ড করলে রানি নির্দেশ দিয়ে জানবাজারের বাড়ি থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে যানচলাচল বন্ধ করে জনজীবন স্তব্ধ করেছেন। বিদেশী শাসক মাথা নত করে জরিমানার অর্থ ফেরৎ দেয়। দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিদ্ধে নানা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ তাঁর জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা প্রেমেরই প্রকাশ।
রাসমণি ধর্মচেতনা সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবনা ও হিন্দুধর্মের সংস্কারে তিনি ছিলেন উদার ও মুক্তমনের। সে যুগেও তিনি হিন্দুধর্ম বা বৈদিক ধর্মের পথ থেকে সরে আসেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই ধর্ম। তাঁর চিন্তাধারা ছিল বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিভিত্তিক। তিনি ধর্মকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পথ ভাবেননি। রঘুবীর শিলার নিত্যপুজা ছাড়া ও রাজবাড়িতে বাৎসরিক কালীপুজা, জন্মষ্টমী, জগদ্ধাত্রী পুজা, দুর্গাপুজা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা, লক্ষ্মীপুজা সব অনুষ্ঠানে কয়েকহাজার লোকের কয়েকদিনের জন্য প্রসাদের নামে সসম্মানে অন্ন ব্যবস্থা থাকত।
নবদ্বীপ, হংস্বেরী মন্দির, ত্রিবেণী, গঙ্গাসাগর, পুরীধাম ইত্যাদি স্থানে নিয়মিত তীর্থভ্রমণ ছাড়াও তীর্থযাত্রিদের সুবিধার্থে পান্থশালা, তীর্থনিবাস নির্মাণ করেছিলেন। তীর্থস্থানে রানি প্রভূত দান করতেন সেখানকার অন্ধ দীনদরিদ্রদের মধ্যে। নবদ্বীপে পন্ডিতদের সেবার জন্য কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করেন। এইসব দানে ব্যয় করেন লক্ষ লক্ষ টাকা। তাঁর দানের কথা প্রচার হলে একবার তীর্থ থেকে ফেরার পথে নদীতে ডাকাতরা টাকা চেয়ে নৌকা ঘিরে ফেলে। রানি যা ছিল দিয়ে পরে আরও ১২ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। তাঁর প্রভাবে ডাকাতরা ডাকাতি ছেড়ে সৎপথে যোগ দেয়।
স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেও তিনি ছিলেন গোঁড়ামি মুক্ত। আব্যল্য বৈষ্ণবী হয়েও শিব ও শক্তির পূজারী। হিন্দু হয়েও ইসলামের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এই ধর্মনিরপেক্ষ রূপ থেকেই সর্ব ধর্মসমন্বয়ের চিন্তার প্রকাশ ঘটে।
দক্ষিণেশ্বরের মন্দির নির্মাণের স্থানটির মাহাত্ম হল - পাশাপাশি খ্রিষ্টানদের কুঠিবাড়ি, মুসলমানদের মাজার, গাজীমাহেবের দরগা। এইগুলি স্বমর্যাদা রক্ষা

করেই শ্যাম ও শ্যামা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাই ধর্মসমন্বয়ের জননী ও গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণে রূপান্তর তাঁরই কীর্তি। আপাত আচার বিচারহীন এই ভাবোন্মাদ বালকের মধ্যে তিনি চিনতে পেরেছিলেন ভাবী সাধককে, বিদ্ধবাদীদের কথায় কান দেননি।

সেযুগে তাঁর কল্যাণকর্মে বহু বাধাও এসেছে পন্ডিতসমাজ থেকে। কিন্তু কেউ তাঁকে খতে পারেনি, তিনি সহজগতিতে সবাইকে ছাপিয়ে কীর্তিময়ী হয়েছেন। সেইসব অমূল্য তথ্য ও উপলব্ধির উল্লেখ করেছেন কিছু জ্ঞানী, গবেষক, সুলেখক, ঐতিহাসিক মানুষ। রানি রাসমণিকে বুঝতে গেলে তাঁর কিছু উল্লেখ কর া প্রয়োজন।

গবেষক ও সুলেখক বঙ্কিম ব্রহ্মচারী তাঁর 'নারী ঋষি রানী রাসমণি' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন - 'চিত্তসংযম, চিত্তশুদ্ধির অন্তরলোক উদ্ভাসিত হলে তৃতীয় চক্ষু উন্মিলিত হয়ে দূরদৃষ্টিলাভ হয়। তাকেই বলে ঋষিত্ব। রানি রাসমণির মধ্যে ঋষিসদৃশ সেই দৈব্যদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি সম্যকরূপে বিকশিত ছিল।

নারী ঋষি রাসমণির নাম যুগ যুগ ধরে ভারতীয়দের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকবে। খনা, লীলাবতী, গার্গীদের মত রানি রাসমণি কোন জাতের ছিলেন সে প্রশ্ন কেউ তুলবে না। রাসমণির অবদান যতই অলিখিত ও অনুচ্চারিত হোক না কেন - তাঁর কীর্তি সূর্যালোকের মত সকলের চোখে উজ্জল হয়ে থাকবে।

বঙ্কিম ব্রহ্মচারী উল্লেখ করেছেন রাম চৌধুরী, ভগিনী নিবেদিতা বা দক্ষিণারঞ্জন বসুর মন্তব্য। ডঃ রাম চৌধুরী বলেছিলেন -'নারী যে শক্তিরূপিনী রানি র াসমণি সেই প্রমাণ দিয়ে গেছেন। তিনি শুধু শক্তি স্বরূপিনী ছিলেন না দরিদ্র দেবভব লোক হিতৈষণায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সাক্ষাৎ লোকমাতা।'

সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন - 'রাসমণি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অধ্যাত্মজননী।' ভারতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা আরও স্পষ্ট করে বললেন - 'রানীর মূল্যয়ান এখনও শু হয়নি। তবে এটুকু বলা যায় রানী রাসমনি না হলে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হত না, কালীমন্দির না হলে গদাধর শ্রীর ামকৃষ্ণ হতেন না, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকেও পাওয়া যেত না। এসবের মূলে নারী ঋষি রাসমণি।'

বঙ্কিম ব্রহ্মচারী আরও বলেছেন -'দক্ষিণেশ্বর ধর্মস্থান নয় এটি ছিল নব নব ভাব সৃষ্টির প্রেরণাকেন্দ্র ও মণীষী সৃষ্টির কারখানা।..... এই পুণ্যভূমি প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল এক রমনীর কঠোর সাধনা ও দুরদৃষ্টি। তাঁর চিত্তসংযম, শুচিশুদ্ধ পবিত্র জীবনচর্চা, জাতীয়তাবোধ, জীবসেবা মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, অন্যায়ের বিদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও সৎকাজে সাহায্য তার চরিত্রকে শতদলের পাপড়ির মত বিকশিত করে তুলেছিল। এতদ সত্ত্বেও এতাবৎকাল উচ্চবর্ণেরা রাসমণিকে নিম্নবর্ণ বোধে ইতহাসে উপেক্ষা করে এসেছে।..... দক্ষিণেশ্বরের স্থান নির্বাচন থেকে শু করে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা ও পূজা অর্চনাদির নির্ঘন্ট নির্ণয় করা পর্যন্ত প্রবল প্রতিরোধ ও সমালোচনার সমধ্যে পড়তে হয়েছিল রাসমণিকে। ..... সেদিনের সমাজপতি পুষদের মধ্যে কোন একজনও তার পাশে দাঁড়াননি।..... কলকাতায় সেদিন সংখ্যা কম ছিল না। তাঁদের মধ্যে একজন যা করতে পারেননি যেখানে সেখানে একজন অন্তরপুরচারিনীর এই কর্মকান্ড রচনা স্বাভাবিকভ াবে সামাজিক বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল। ..... শুধু সম্বল দৃঢ় সংকল্প। উদ্দেশ্যসাধনে একাগ্রচিত্ত। সহস্র প্রকারের কুটকচালির উত্তরে শুধু বললেন - 'মাটি চির পবিত্র। যত ধর্ম, তত মত.... তত পথ। এখানে, সমবেত হোক সকল ধর্মের মানুষ এই হলো আমার শেষ কথা।' এই তিন কথায় ভেসে গেল সব শাস্ত্র বচন ও পন্ডিতদের যুক্তিবিচার। মুক্ত চিন্তার এক উজ্জ্বল প্রতিভা সেদিন দেখা দিয়েছিল।..... ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এদেশের অসংখ্য মণীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের জীবনকর্ম ও অবদান দিয়ে বিস্তর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রানী রাসমণির উপর কেউ কোন পুস্তক রচনা করেনি। এই একদেশদর্শিতা একটা জাতির পঙ্গুত্বের লক্ষণ ..... শূদ্ররাজ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এদেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। প্রতিভাধর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শতবছর পূর্বে এই সত্য প্রচার করে গেছেন।' ---- বঙ্কিম ব্রহ্মচারী - 'নারী ঋষি রাসমণি' (পৃঃ ১৯ - ২৪)

পন্ডিত ও সুলেখক ডঃ শিশুতোষ সামন্ত রানি রাসমণির বিষয়ে বলেছেন - 'ইংরেজ শাসকদের বিদ্ধে খে দাঁড়ান তো দূরের কথা, একটি বিদ্ধ সমালোচনা কর ার ভাবনাও সে যুগে কোন পুষের পক্ষে সাহসে কুলোয়নি, সে যুগে স্বল্পশিক্ষিত এক কৃষককন্যা রাজকূলবধূ রূপে ক্ষাত্রতেজের যে চরম নির্দশন রেখে গেলেন, সত্যনিষ্ঠ লেখক, পাঠক ও গবেষকের কাছে তা শুধু পরম বিস্ময়ের ব্যাপারই নয়, বুকভরা গর্বেরও বটে। ভারতের ইতিহাসের পাতায় উঠে আসা বীরাঙ্গনা নারীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ..... রিজিয়া সুলতানা, অহল্যাবাঈ, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ ..... হাওড়ার গড় ভবানীপুরের রায়বাঘিনী, ভবশঙ্করী, নাটোরের রানি ভবানী প্রমুখ বীরাঙ্গনা ..... রানি রাসমণি এঁদেরই উত্তরসূরী। .....রানি রাসমণি অমর্তলোক হতে মর্তলোকে এসেছিলেন তৎকালীন ভারতের সমাজমানসে ও ধর্মীয় আকাশে যে পাঁক ও কলঙ্ক কালিমা জমেছিল তাকে পরিষ্কার করে ভারতকে এক শুচিসুন্দর রূপদান করতে।.....ধর্মাচারণের ক্ষেত্রে তিনি আধ্যাত্মিক পটভূমি রচনা করলেন দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে সেবায় ও সহনশীলতায় - সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন ভ াবীকালের ভাবী রামকৃষ্ণকে .....'

ডাঃ শিশুতোষ সামন্ত 'দিশারী' (মাহিষ্য সমিতির শতবর্ষপূর্তি পত্রিকা পৃঃ ৬৪-৬৭)

ডঃ শিশুতোষ সামন্ত রাসমণির কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিকের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। ঐতিহাসিক প্রথিত চৌধুরী বলেন - 'শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর রানি রাসমণির মন্দির পঞ্চবটি তীর্থে পরিণত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটি তলে বসে বিপ্লবী বাঘাযতীন, রাসবিহারী বসু, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্য ায় ভারতবর্ষে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে নবভারতের উত্থান। তাঁর গুর সাধনভূমি মা ভবতারিনীর মন্দির। সে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী লোকমাতা রানি রাসমণি। মনস্বিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী লোপামুদ্রা প্রমুখ ভারতীয় নারীরত্নের তালিকায় আর একটি উজ্জ্বল নাম রানি রাসমণি।' 'দিশারী পৃঃ ৬৮।

দুঃখের বিষয় এতবড় একজন মহিয়ষী নারীর কথা ইতিহাসে যথাযথ তুলে ধরা হয়নি। ময়দানে মূর্তি বসালেই শুধু হয় না, তাঁর জীবনকীর্তি বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মের কাছে প্রকৃত ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা দরকার। ইতিহাসে তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত থেকে যাবেন চিরকাল । ক্রমে মূল্যায়ন হবে তাঁর বিশাল কর্মকান্ড ও ব্যাক্তিত্বের -সেই যুগে তিনি যে কি যুগান্তকারী ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন - এযুগে ও তা বিস্ময়কর মনে হয়। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চত্বরে দঁ াড়ালে বিস্ময় অভিভূত ও নির্বাক হয়ে যাই। গঙ্গার জলধারার দিকে দৃষ্টিপাত করে মন চলে যায় কোন সুদূর অতীতে। মাকে প্রণাম করার পরেই কেবল রানি রাসমণির কথা মনে হয় - তাঁর বিশাল আশর্চ্য ব্যক্তিত্ব ও কীর্তির কথা ভাবি। তাঁর নির্দেশিত পথে, তাঁর তৈরি করা ক্ষেত্রে ঘটে গেছে মহাবিপ্লব --- এসে গেছে নবযুগ। তিনি অনেক বিষয়ে সংগ্রাম, পরিকল্পনা ও সুব্যবস্থা না করলে আমরা মূল্যবান অনেক কিছুই পেতাম না। তিনি সত্যিই জননী, লোকমাতা, ঋিম াতা। তাঁর আলোকিত জীবন বাংলা তথা ভারতকে দিয়েছে অতুলনীয় ও অভাবনীয় অনেককিছু।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. ডঃ শিশুতোষ সামন্ত - 'রাজক্ষত্রানী রানী রাসমণি'
২. ডঃ শিশুতোষ সামন্ত - 'যুগজননী রানী রাসমণি' (দিশারী - মাহিষ্য সমিতি শতবর্ষপূর্তি পত্রিকা)
৩. বঙ্কিম ব্রহ্মচারী - 'নারী ঋষি রাসমণি'
৪. জাগ্রত ভারত
৫. বৈষ্ণবাচার্য বঙ্কিমচন্দ্র সেন ---- 'লোকমাতা রানী রাসমণি'

৬. অধ্যাপক দেবপ্রসাদ চৌধুরী — ‘রানী রাসমণির জীবন বৃত্তান্ত’।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com